পরিকল্পিত মহাবিশ্ব?

স্টিভেন ওয়েইনবার্গ

অনুবাদ : দিগন্ত সরকার

এই মহাবিশ্ব কি কারো পরিকল্পনা কিংবা হাতের নকশায় তৈরী বলে আমার মনে হয় কিনা – এ নিয়ে আমায় কিছু লিখতে বলা হয়েছে। কিন্তু নকশাকারী সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকলে এ নিয়ে কি ভাবে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব? যে কোনো মহাবিশ্বই সাদা চোখে কারো না কারো নকশা কিংবা পরিকল্পনায় তৈরী বলে মনে করা যেতে পারে। যদি সেই মহাবিশ্বে কোনো সূত্র না খাটে আর সেটা একেবারে বিক্ষিপ্ত আর এলোমেলো হয় – তাহলে সেটা হবে হয়ত কোনো মূর্খের তৈরী মহাবিশ্ব।

বরং যেটা নিয়ে কিছু আলোচনা চলতে পারে, সেটা হল আমাদের মহাবিশ্ব কি আমাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যেমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে - সেরকম কোন ঈশ্বরের বা শক্তিমান কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি? প্রশ্নটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য নয় বলেই আমি মনে করি। আমাদের এই মহাপরিকল্পনাকারী পোপের বাসস্থান সিস্টাইন চ্যাপেলের ছাদের খোদাই করা ভাস্কর্যের মত না হলেও এক ধরনের ব্যক্তিত্বময়, বুদ্ধিদীপ্ত এবং সৃষ্ট জীবনের প্রতি, বিশেষত মানব জীবনের প্রতি করুণাময় হবেন বলে ভাবা যেতে পারে। আমি মনে করি আপনাদের অনেকেই এখানে নিখিল বিশ্বের এরকমের একজন নকশাকারীর চিরন্তন প্রতিমূর্তিতে আস্থাশীল নন। আপনার মানসপটে হয়ত রয়েছে আরো বিমূর্ত কিছু - প্রকৃতির সুষম এবং সামঞ্জস্যময় নিয়মের মধ্যে ব্যপ্ত এক মহাজাগতিক বিমূর্ত সত্ত্বা - অনেকেটা আইনস্টাইন যেমন কল্পণা করেছিলেন। আপনি অবশ্যই আপনার চিন্তার লাটাইকে এরকম অসীম নীলিমায় নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু সেরকম বিমূর্ত একটি ধারণাকে কেন "নকশাকারী' কিংবা 'ঈশ্বর' হিসেবে অভিহিত করতে হবে, তা আমার সত্যই বোধগম্য নয়।

যে কোনো জীবের কিছু অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মনে হয় এই সৃষ্টিকর্তা জীবনের ব্যাপারে বেশীই উৎসাহী। আগুন, বৃষ্টি বা ভূমিকম্পও কি সেই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে? আজকের জগতে আমরা এসব প্রাকৃতিক শক্তির মূলে যে সূত্রগুলো কাজ করে তার অনেকটাই জেনে ফেলেছি। তাও, আরো পরম কিছু সূত্র আর আমাদের জানা সূত্রগুলোর ক্রিয়াকলাপের নিখুঁত পরিমাপ করে ভবিষ্যতবাণী করাও আমাদের পক্ষে এখনও সম্ভব নয়। আমরা জানি বৃষ্টি কি ভাবে হয়, কোন কোন প্রাকৃতিক শক্তি একে নিয়ন্ত্রণ করে – কিন্তু আজ থেকে ঠিক এক মাস পরে বৃষ্টি পড়বে কি না, সেটা আমরা সঠিক ভাবে বলতে পারি না। মানুষের মনও এরকমই কিছু দুর্বোধ্য সূত্রে চলে, যা আমরা কিছু কিছু জানি – কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ভবিষ্যতবাণী করার মত অবস্থায় আসি নি।

এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা একটা বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে মূল প্রাকৃতিক সূত্রাবলীর কোনো ব্যতিক্রম হয় না – অন্যভাবে বললে, অলৌকিক কিছু ঘটে না। যা ঘটে তাকে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব – আজকে সে সূত্র না জানা থাকলে কালকে তা আবিষ্কৃত হবেই। সেখানে অধিকাংশ ধর্মই দাঁড়িয়ে আছে এই ধরণের কিছু অলৌকিকতার ওপর – যেমন মৃত যীশুর বেঁচে ওঠা বা কোনো

এক দেবদূতের মহম্মদের কাছে এসে উপদেশ পড়ে শোনানো – এ সবই বাস্তব বা লৌকিকতার ঊর্ধ্বে। এই সব অলৌকিক গল্পকথারা বিজ্ঞানের চোখে রূপকথার পরীর গল্পের মতই শোনায় – আর আমরা আজকের দিনে রূপকথায় বিশ্বাস রাখি না। আমরা এমন কি বুঝে গেছি যে মনুষ্যজাতি হাজার হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের ফসল – প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটু একটু করে পরিবর্তিত হতে হতে এই অবস্থায় এসেছে।

এই অবস্থায় আমি পরম কিছু সূত্র ছাড়া আর কোথাও তো কোনো সৃষ্টিকর্তার নকশা থাকার সম্ভাবনা দেখতে পাই না – বাকি সবই তো প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরী। এই পরম সূত্রগুলোকে বলা যেতে পারে শেষ ও পরম সত্য – যার ওপর ভিত্তি করে সমগ্র প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলো পরিচালিত হয়। আমরা সেই সূত্রগুলো এখনো সঠিকভাবে জানি না বটে, কিন্তু এটুকু অনুধাবন করার মত জায়গায় পৌঁছেছি যে এর মধ্যে জীবন বা জীবের কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। রিচার্ড ফেইনম্যান বলেই গেছেন –

"এই সুবিশাল বিশ্বব্রম্ভান্ড দেখে ও তার সূত্রগুলো বুঝে ওঠার পরে এটা মেনে নেওয়া খুবই শক্ত যে ঈশ্বর মহাবিশ্ব সৃষ্টিই করেছেন মানুষের ভাল-মন্দ বিচারের জন্য।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স যখন প্রথম বিজ্ঞানীমহলে আলোচিত হত, তখন অনেকেই মনে করেছিলেন যে এরই মাধ্যমে প্রাকৃতিক সূত্রে আবার মানুষের স্থান ফিরে এল – কারণ, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্রগুলো অনেকটাই পর্যবেক্ষক নির্ভর। কিন্তু গত চল্লিশ বছরে হাফ এভারেট (Hugh Everett) থেকে শুরু করে তার পরবর্তী বিজ্ঞানীদের অনেকেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে আবার অন্য এক মাত্রা দান করেছেন – এখন তাই আর বিজ্ঞানীরা মানুষ-পর্যবেক্ষকের ধারণা নিয়ে কাজ করেন না, তারা পর্যবেক্ষককে আর দশটা প্রাকৃতিক বস্তুর মতই মনে করেন।

এটা পদার্থবিদ হিসাবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে পরম-সূত্রে পৌঁছবার পরেও পদার্থবিদেরা মহাবিশ্বের সমস্ত কার্যকলাপের সঠিক ব্যাখ্যায় পৌঁছতে পারবেন না। কারণ তখন একটা নতুন প্রশ্ন উঠে আসবে বারবার – "কেন এই সূত্রই সব ব্যাখ্যা দিতে পারে – অন্য কোনো সূত্র যা পারে না?" কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কথাই ধরা যাতে পারে কারণ এর সূত্রগুলো এখন মোটামুটি পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে প্রতিষ্ঠিত। খুব সম্ভবত এগুলোও পরম সূত্রেরই অংশ হিসাবে স্থান করে নেবে। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রগুলোর মত কোনো নিশ্চিত ভবিতব্য বলে কিছু নেই – সব ফলাফলেরই কম হোক, বেশি হোক- কিছু না কিছু সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং বিজ্ঞানে কিছুটা রহস্যময়তা সব সময়ই হয়তো থেকেই যাবে – যাকে আরো নিখুঁত ভাবে ভবিতব্য আকারে প্রকাশ করাই সম্ভব হবে না। কিছু 'কেন' পরম সূত্র আবিষ্কারের পরও অজানা রয়ে যাবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে ধর্মভিত্তিক সব ব্যাখ্যারও একই সমস্যা। একটা মাত্রার পরে আর 'কেন'-র উত্তর মেলে না। যদি ঈশ্বরকে কোনোভাবে নির্দিষ্ট না করা যায় তার আচরণ দিয়ে তবে সেই ব্যাখ্যার তো কোনো মানেই দাঁড়ায় না – সেখানেও প্রশ্ন আসে কেন ঈশ্বরের আচরণ নির্দিষ্ট নয়? আর যদি মনে করা হয় ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন, বা ঈর্ষাপরায়ণ বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন – সেখানেও সেই একই প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসে – কেন? ধর্মে বলা থাকতে পারে মহাবিশ্ব ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সেই ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন, কিন্তু কোনোভাবেই জবাব দিতে পারে না যে কেন এমন ঘটে।

এই আলোচনা থেকে আমার মনে হয়েছে যে বিজ্ঞান এই সব ‘কেন’র উত্তর কিছুটা হলেও দিতে পারে, ধর্ম তা-ও পারে না। বিজ্ঞানের সূত্রগুলো হয়ত বলতে পারে না যে কেন এগুলো একেবারে সম্পূর্ণ আলদা কেন হল না – কিন্তু সামান্য কিছুটা আলাদা কেন নয় তা সহজ অঙ্কের মাধ্যমেই বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব। যেমন কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে সামান্য কিছু পরিবর্তিত রূপে বিশ্লেষণ করলে কিংবা আপেক্ষিকতার সাথে সমন্বিত করতে চাইলে সমীকরণগুলো অবাস্তব, অসীম বা ঋণাত্বক সম্ভাবনার ফলাফল দেয়। একদম ঠিকঠাক ভাবে না সাজালে এই সূত্রগুলো কিছু অবাস্তব ভবিষ্যতবাণী করতে থাকে। অন্যদিকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা সর্বদাই পরিবর্তনক্ষম – যুগে যুগে কতবার যে এদের ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে তার শেষ নেই – ভবিষ্যতেও হবে। ধর্মীয় ব্যাখ্যা অনুসারে কালকেই হয়ত পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরা বন্ধ করে দিতে পারে কোনো অদৃশ্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় – বিজ্ঞানের তত্ত্ব মেনে তা পারে না।

অনেক পদার্থবিদের দাবীমতে আমাদের মহাবিশ্বের মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান রহস্যময়ভাবে ঠিক এমনই (সূক্ষ-সমন্বয়), যাতে আমাদের মহাবিশ্বে প্রাণের সঞ্চার হওয়া সম্ভব। তাদের দেখলে মনে হয় যে যেন কোনো পরিকল্পনাকারী মানগুলো এমন ভাবেই সাজিয়েছেন যাতে পরবর্তীতে তিনি প্রাণের সঞ্চার করতে পারেন। আমি এই সূক্ষ-সমন্বয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কার্বন নিউক্লিয়াসের বহুল প্রচারিত উদাহরণই বেঁছে নেই। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম কয়েক মিনিটে সৃষ্ট মৌলগুলো ছিল হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। এর মধ্যে কার্বন, নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনের তখনো কোনো নামগন্ধই ছিল না। এই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী মৌলগুলো তৈরী হয়েছে প্রথম যুগের কিছু নক্ষত্রের মধ্যে, আর তারপরে তারার বিস্ফোরণের পরে ছড়িয়ে গেছে মহাবিশ্বে। এরকমই কিছু মৌল-সমৃদ্ধ অংশেই পরে সৌরজগত গঠিত হয়েছে।

এই হালকা মৌল থেকে ভারী মৌল তৈরী হবার প্রথম ধাপ হল তিনটি হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস মিলে একটা কার্বন পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন। কিন্তু তিনটে হিলিয়াম পরমাণুকে জোড়া দেওয়া তো সহজ কাজ নয়। নক্ষত্রের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তেজস্ক্রিয় কার্বন সংশ্লেষ হতে গেলে তার শক্তি মাত্রা হতে হবে তিনটে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের শক্তি মাত্রার সমান - সাধারণের তুলনায় ৭ থেকে ৭.৭ মিলিয়ন ইলেক্ট্রিক-ভোল্ট (MeV)এর মধ্যে। একবার তেজস্ক্রিয় কার্বন গঠন হয়ে গেলে সেখান থেকে সহজেই তা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে সাধারণ কার্বনে পরিণত হতে পারবে - যা আমাদের পৃথিবীতে আমরা পাই। কিন্তু সবই নির্ভর করে ওই তিনটে হিলিয়াম থেকে একটা তেজস্ক্রিয় কার্বন নিউক্লিয়াস গঠনের ওপর।

কার্বন নিউক্লিয়াস এমনই একটি তেজস্ক্রিয় অবস্থা আছে যাতে সে সাধারণের তুলনায় ৭.৬৫ MeV এনার্জি লেভেল-এ থাকে। এই মান মাত্র আরো এক শতাংশ (৭.৭০ - ৭.৬৫ = ০.০৫) বেশী হলে কিন্তু তারায় আর কার্বন সংশ্লেষ হত না। ঝট করে দেখলে মনে হবে যেন এই মান কার্বন পরমাণু তৈরী হবার জন্যই সাজানো। কিন্তু আরো গভীরে গেলে বোঝা যায় ব্যাপারটা মোটেও এমনকিছু সাজানো নয়। আমাদের দেখতে হবে ঠিক কেন সাধারণের তুলনায় ৭.৭ MeV উচ্চ এনার্জি লেভেল দরকার হয় তারায় কার্বন সংশ্লেষের জন্য। কারণ, দুটো ধাপে তেজস্ক্রিয় কার্বন সংশ্লেষ হয়। প্রথথম ধাপে, দুটো হিলিয়াম নিউক্লিয়াস একজোট হয়ে গঠন করে বেরিলিয়াম ৮ বলে একধরণের আইসোটোপ, যা পরের ধাপে আরেকটি হিলিয়াম পরমাণুকেও সাথে নিয়ে তেজস্ক্রিয় কার্বন গঠন করে। তাহলে এখন আমরা কার্বনকে আর তিনটি হিলিয়ামের সংযুক্তি না ভেবে একটি বেরিলিয়াম আর একটি হিলিয়ামের সংযুক্তির ফলে প্রস্তুত হয়েছে বলে মনে করতে পারি। সাধারণ অবস্থায়, একটি বেরিলিয়াম আর একটি হিলিয়ামের মিলিত এনার্জি লেভেল ৭.৪ MeV। তাহলে, আসল ফ্যাক্টর হল এই

অতিরিক্ত ০.৩ MeV শক্তি, যা নক্ষত্রের মত তাপমাত্রায় পাওয়া দুষ্কর। তাহলে আসল ফ্যাক্টর দাঁড়ায় এই ০.২৫ MeV অতিরিক্ত (৭.৬৫-৭.৪০=০.২৫) শক্তি, যা কিনা আরো ০.০৫ MeV বেশী হলেই তারায় কার্বন সংশ্লেষ দুরূহ হয়ে যেত। তাহলে ফ্যাক্টর হল এক শতাংশ নয়, প্রায় কুড়ি (০.০৫/০.২৫ = ২০%) শতাংশ - যা মোটেও মুখের কথা নয়। তাই কার্বন সংশ্লেষ নিয়ে সাজানো মানের দাবী বিতর্কিত।

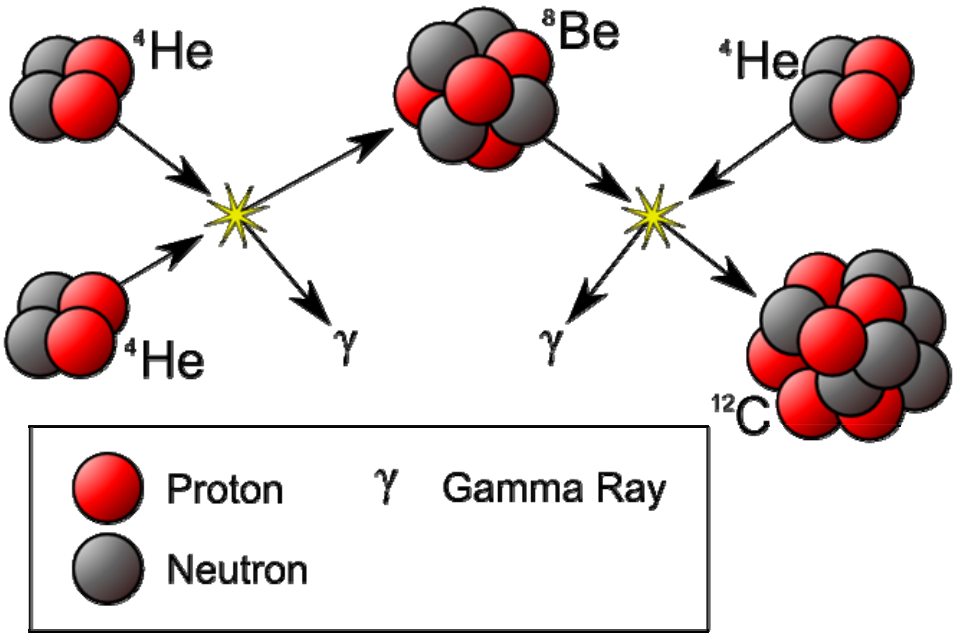

চিত্রঃ ত্রিপল আলফা বিক্রিয়ায় কার্বনের উদ্ভব

কিন্তু এমন একটা ধ্রুবক আছে যার মান একদম জীবন সৃষ্টির উপযোগী করেই সাজানো বলে মনে হয়। সেটা হল মহাজাগতিক ধ্রুবক বা কসমোলজিকাল কনস্ট্যান্ট - যা আসলে শূন্যস্থানের এনার্জি-ডেনসিটি। এর মান এর মান ধনাত্বক বা ঋণাত্বক হতে পারে, বড়ো বা ছোট হতে পারে। যদি বড় ও ধনাত্বক হত তাহলে বিশ্বসৃষ্টির পরের মুহূর্ত থেকেই সব পদার্থকে একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে দিত, যার ফলে পদার্থ একত্র হবার কোনো সুযোগই পেত না, পরে তা থেকে নক্ষত্র, গ্রহ বা প্রাণ তৈরীও হত না। আবার যদি এর মান বড় ও ঋণাত্বক হত, তাহলেও মহাকর্ষকে প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতাই তৈরী হত না, এবং মহাবিস্ফোরণে সৃষ্টির কিছুক্ষণের মধ্যেই তা আবার চুপসে একে অপরের ঘাড়ে এসে পড়ত - জীবন সৃষ্টি হবার পর্যাপ্ত সময়ই পেত না। পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে, আমাদের মহাবিশ্বের কসমোলজিকাল কনস্ট্যান্ট-এর মান যথেষ্ট কম, যার ফলে উপরোক্ত কোনো ঘটনাই ঘটে না। অথচ, প্রাথমিক সূত্র থেকে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে এর মান যথেষ্ট বড় হওয়া সম্ভব।

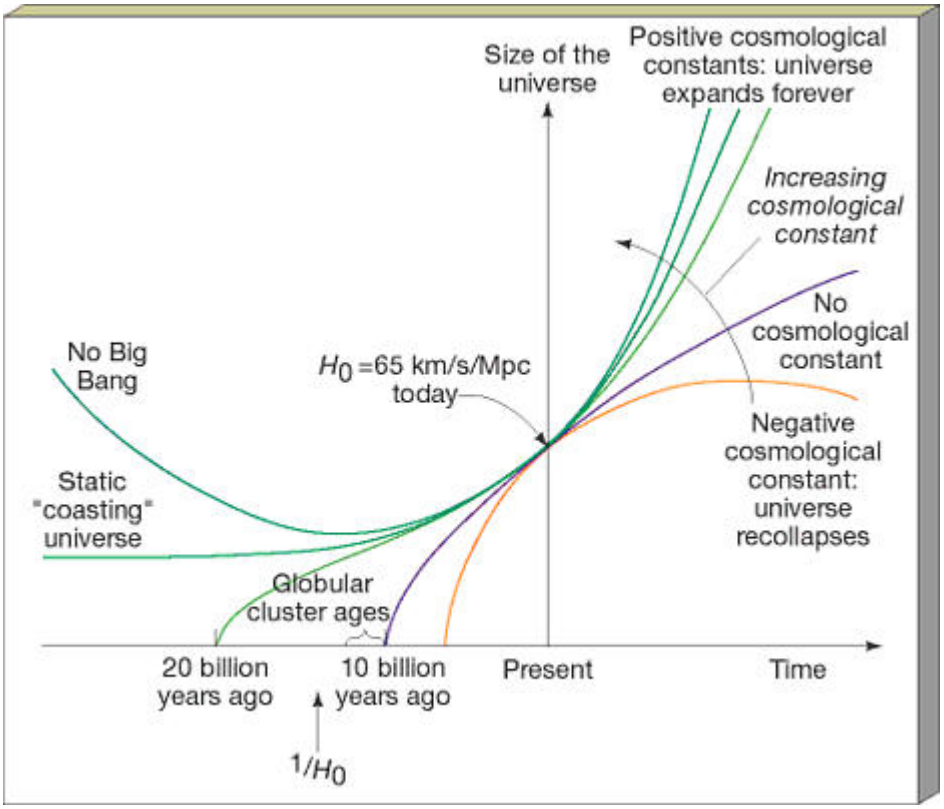

চিত্রঃ মহাজাগতিক ধ্রুবক বা কসমোলজিকাল কনস্ট্যান্ট কি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সূক্ষভাবে সমন্বিত?

এখনো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে কেন কসমোলজিকাল কনস্ট্যান্ট-এর মান এত কম - কোনো সূত্র এখনো অবধি এর মান কম হবার ব্যাখ্যা দেয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় প্রকাশিত তথ্য থেকে কিছুটা অনুমান করা সম্ভব কেন আমাদের মহাবিশ্বে ধ্রুবকগুলোর মান এত নিখুঁতভাবে সজ্জিত। আন্দ্রেই লিন্ডের "ক্যাওটিক ইনফ্লেশন" তত্ত্ব অনুসারে আমরা যে গ্যালাক্সির সমষ্টিকে মহাবিশ্ব বলে জানি তা হয়ত আসল মহাবিশ্বের একটা অংশমাত্র আর যে মহাবিস্ফোরণে আমাদের দৃশ্যমান বিশ্ব তৈরী, সেরকম অসংখ্য বিগ-ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ এরকম বহু সংখ্যকক মহাবিশ্বে তৈরী করে চলেছে। আর প্রতিটি মহাবিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট অন্যান্য মহাবিশ্বের মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান ভিন্ন ভিন্ন মানের।

এই অবস্থায় আমাদের বুঝতে অসবিধা হবার কথা নয় য, অসংখ্য মহাবিশ্বের মধ্যে আমরা সে মহাবিশ্বেই বাস করি সেটায় জীবনের উৎপত্তি হতে পেরেছে কারণ এর মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান হয়তো জীবন গঠনের উপযোগী। আরো অনেক মহাবিস্ফোরণের ফলে উদ্ভুত অন্য মহাবিশ্বের মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান হয়ত তেমন উপযোগী নয় - তাই সেখানে প্রাণের বিকাশও হয় নি। আমরা নাহয় বাসযোগ্য অংশে বসে আধ্যাত্মিকতার ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে কল্পিত সৃষ্টিকর্তাকে প্রশ্ন করতে পারি যে কেন এখানে জীবন আছে, কিন্তু আরো হাজারটা মহাবিশ্বের কিংবা এই মহাবিশ্বের অধিকাংশ স্থানে এ ধরণের প্রশ্ন করার মত কেউ থাকবেও না। যদি এধরনের কোনো তত্ত্ব স্বীকৃতি পায়, তার পরেও মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলো নিয়ে এই রকমের প্রশ্ন করার অর্থ হবে একটাই -

"ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীতে স্থাপন না করে যদি শুক্র বা প্লুটোতে স্থাপন করতেন আমাদের কত না সমস্যাই হত। আমরা এখানে জল, মাটি, বাতাস আর অভিকর্ষের কল্যাণে কত ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারছি। সৌরজগতে পৃথিবী ছাড়া আর কোনো জায়গায় কি আমরা এভাবে বাঁচতে পারতাম ?"

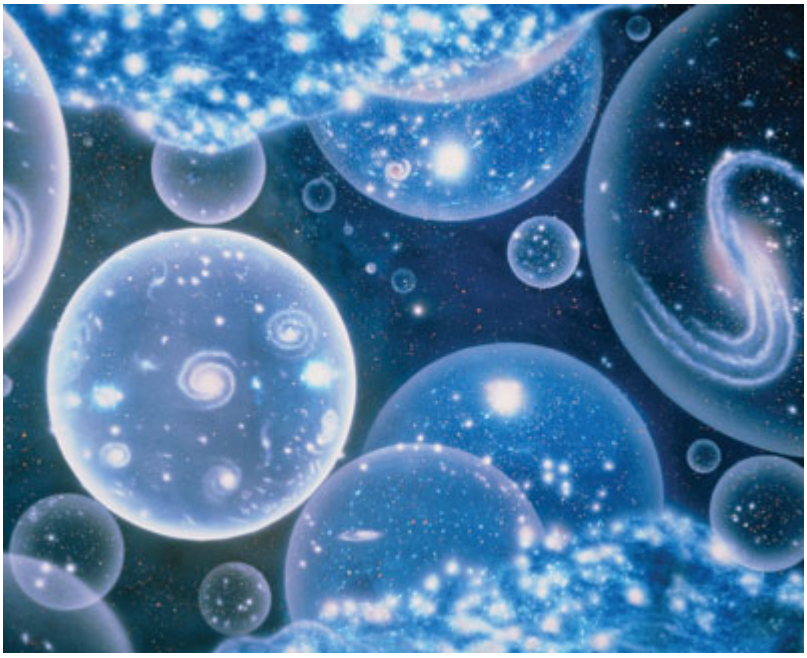

চিত্রঃ মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের কল্পিত চিত্র

এই রকমের যুক্তিকে বলা হয় নৃ-কেন্দ্রিক বা এন্থ্রপিক। এর বক্তব্য এরকম, প্রকৃতির সূত্রগুলো আমাদের ঠিক ঠাক মত বেঁচে থাকার জন্যই অমন ভাবে তৈরি। আমরা যাতে বেঁচে থাকতে পারি - সে জন্যই সূত্রগুলো অমন- এছাড়া তাদের কাছে আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। এ গুলো আমার চোখে একগাদি আধ্যাত্মিক জবর জং ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। অথচ উল্টোদিক থেকে ভাবলে, হাজারো মহাবিশ্বের ভীরে যে জায়গাটায় সূত্রগুলো এরকম, সেখানেই জীবন গঠিত হতে পেরেছে - আর সেজন্যই আমরা এখানে - সেরকম ভাবে বোধ হয় ভাবতে চাই না। আর অনন্ত মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মহাজাগতিক ধ্রুবক থাকলে সমগ্র মহাবিশ্বের বাসযোগ্য অংশেই আমরা কেন আছি এই প্রশ্ন করা আর সৌরজগতের প্লুটো বা নেপচুনে না থেকে কেন পৃথিবীতে আছি - একই ব্যাপার। কসমোলজিকাল কনস্ট্যান্ট -এর মান এত ক্ষুদ্র যে তা নক্ষত্র গঠনে কোনো বাধাদান করে না। কিন্তু আমরা সত্যি জানি না কেন এর মান এরকমই - এর মান অন্য কিছু হওয়া আদৌ সম্ভব ছিল কিনা। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, মাধ্যাকর্ষণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতে দিতে পারবে।

আরো অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশার চেয়ে জীবনটা আরো অনেকটা সহজ হলে একে না হয় ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে মেনে নেওয়া যেত। এখানে আনন্দ কিংবা সুখানুভূতির কথা ভাবলে মনে রাখতে হবে, মানুষের বা যেকোনো জীবের সাধারণ অনুভূতিগুলোর অনেক কিছুই কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের বৈশিষ্ট্যে স্থান করে নিয়েছে। কারণ বেঁচে থেকে নিজেদের জিন পরবর্তী প্রজন্মে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য খাদ্যগ্রহণ বা প্রজনন করতেই

হয়। হয়ত এটা প্রত্যাশার বাইরে যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে অন্য কোনো গ্রহে একদল জীব সৃষ্টি হবে যারা আমাদের মত অবসর সময়ে জটিল বিজ্ঞান-চিন্তায় মগ্ন থাকবে। এক্ষেত্রে একদল খুব ভাগ্যবান কিছু ব্যক্তি সংকীর্ণ নমুনা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেরা সৃষ্টিকর্তার নকশার কথা ভেবে বাহবা দিচ্ছে। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'সিলেকশন এফেক্ট'।

আমাদের মহাবিশ্ব অনেক অনেক বড়, হয়ত বা অসীম। এটাতে অবাক হবার কিছু নেই যে অধিকাংশ গ্রহেই কোনো প্রাণ নেই এবং যাদের মধ্যে আছে, তারাও হয়ত বেশীরভাগই অনুন্নত প্রকৃতির। খুবই অল্প ভগ্নাংশের জীবের হয়ত এই সৃষ্টিকর্তা সংক্রান্ত চিন্তা করার মত ক্ষমতা আছে। কোনো লটারি বিজেতাকে ইন্টারভিউ নিতে গেলে মনে হতে পারে যে কোনো বিশেষ দৈববলে সে এই লটারীটা পেয়েছে কিন্তু প্রশ্নকর্তার মনে রাখা উচিত যে আরো হাজার জন টিকিট কেটেও পুরস্কার জিততে পারে নি। তাই শুধু সাদামাটা প্রাকৃতিক নির্বাচনে আমরা যতটা উন্নত হতাম, তার চেয়ে সত্যিই আমরা বেশী উন্নত কিনা - এটা ভাবার পাশাপাশি এই পক্ষপাতের কথাও মনে রাখতে হবে যে আমরা নিজেরা কিন্তু নিজেদের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতালব্ধ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমস্যার কথাটা ভাবছি।

এই প্রশ্নের উত্তর নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। এর উত্তর পেতে পদার্থবিদ্যা আমাকে সাহায্য করবেনা। আমার জীবনে আমি খুবই সুখী, বোধহয় আমি মানবসমাজের সবথেকে সুখী ০.০১%এর মধ্যেই থাকব। তাও, আমি এক মা কে দেখেছি ক্যান্সারে মারা যেতে, বাবাকে অ্যালজাইমারসে ভুগে স্মৃতিশক্তি খোয়াতে আর অনেক তুতো ভাইবোনকে গনহত্যায় মারা যেতে। মঙ্গলময় ঈশ্বর তখন কোথায় লুকিয়ে ছিলেন কে জানে।

যারা সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাসী তারা অনেক সময়েই এই দুঃখ-কষ্ট দেখে বিস্মিত হন। আবার অনেকসময়ে 'ফ্রি উইল'-এর কথা বলা হয়। মিল্টন তার প্যারাডাইস লস্ট-এ লিখেছেন :

"আমি তাদের বন্ধনহীন সৃষ্টি করেছি আর তারা তাই থাকবে যতদিন না তারা আমার দাসত্ব স্বীকার করে, নাহলে আমাকে তাদের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে হবে আর আমার আগের আইন স্বাধীনতার নীতি পরিবর্তন করতে হবে - এভাবে তারা নিজেদের পতন ডেকে আনবে।"

আমার ভাইবোনেদের জার্মানদের হাতে মৃত্যু কি তাহলে জার্মানদের 'ফ্রি উইল'-এর প্রভাব? তাও অন্যের হাতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায়, ক্যান্সারে মৃত্যু কি টিউমারের ফ্রি উইলের ফল?

এইসব দুঃখদুর্দশা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সাথে জড়িত কিনা সে নিয়ে আমি চিন্তিত নই, কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে সে ধরণের সৃষ্টিকর্তা কখনই মঙ্গলময় নন। অ্যাস্ক্যাইলাস বা ইউরিপিডিসের প্রাচীন গ্রীক নাটকে তারা

অনেককাল আগেই দেখিয়েছিলেন যে ঈশ্বর স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির কিন্তু মানুষের কাছ থেকে ভাল ব্যবহারই আশা করেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বরও একইরকম ভাবে আমাদের নির্দেশ দেন অবিশ্বাসীদের মেরে ফেলতে, এমনকি তার নির্দেশে নিজের সন্তানকে বলি দিতে বলেন। খ্রীষ্টান আর ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর আবার আমাদের সারাজীবনের জন্য পরিত্যাগ করবেন যদি আমরা তাদের ঠিকঠাক আরাধনা না করি। এটা কেমন ব্যবহার হল? আমি জানি হয়ত ঈশ্বরকে মানুষের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না কিন্তু এখানে সমস্যা হল, যার অস্তিত্ব নিয়েই এত সংশয় তার মঙ্গলময় দিকটা তুলে ধরার জন্য আমরা তাহলে কোন্ মাপকাঠি ব্যবহার করতে পারি?

উইলিয়াম প্যালের এই 'আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন' এখন আর মানুষের মাথায় সেরকম ভাবে নেই। ধর্মের সম্মান এখন নৈতিকতার উ□স হিসাবে। আমি এখন কষ্ট করে এই লেখাটা লিখছি কারণ আমি মনে করি নৈতিকতা প্রসঙ্গে ধর্মের অবদান মোটেও খুব একটা ভাল নয়। এখানে একটা বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। একদিকে দেখলে ধর্মের জন্য মানবসভ্যতার ইতিহাসে কুসংস্কার, জিহাদ আর ক্রুসেডের মত ঘটনা ঘটেছে। আমাদের এই শতকেই একজন মুসলিম ধর্মান্ধ হত্যা করেছে সাদাতকে, ইহুদী ধর্মান্ধ হত্যা করেছে রূ্যাবিনকে আর হিন্দু ধর্মান্ধ হত্যা করেছে গান্ধীকে। হিটলারকে খ্রীষ্টান ধর্মান্ধ বলাটা হয়ত বাড়াবাড়ি হবে, কিন্তু এটাও ঠিক যে খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতিতে যুগ-যুগান্তরের ইহুদীবিদ্বেষ না থাকলে হিটলার হয়ত ইহুদীনিধনে উদ্যত হতেন না। আবার অন্যদিকে দেখলে অনেক ধার্মিক ব্যক্তিই সমাজে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। যেমন পদার্থবিদ ফ্রিম্যান ডাইসন তার ইম্যাজিনড ওয়ার্ল্ড বইতে লিখেছেন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ধর্মের কল্যাণময় সমর্থনের কথা।

আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু মন্তব্য করব এই দাসপ্রথা নিয়ে। হয়ত কিছু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সত্যিই দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন - যেমন ইংল্যান্ডে উইলিয়াম উইলবারফোর্স বা আমেরিকায় উইলিয়াম এলেরি চ্যানিং। কিন্তু এটাও সত্যি যে আর অনেক ধর্মের মত খ্রীষ্টান ধর্মও কয়েক শতক ধরে দাসপ্রথাকে মেনে নিয়েই চলছিল। দাসপ্রথার উল্লেখ নিউ টেস্টামেন্টেও পাওয়া যায়। তাহলে উইলবারফোর্স বা চ্যানিং-এর ক্ষেত্রে আলাদাটা কি হয়েছিল? এরা তো কোনো দৈবাদেশ পেয়েছেন বলেও দাবী করেন নি, আবার কোনো নতুন পবিত্র গ্রন্থও আবিষ্কার হয় নি। বরং অষ্টাদশ শতকে যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদ প্রসারের সাথে সাথেই অনেকেই দাসপ্রথার বিরোধিতা শুরু করেন - যেমন অ্যাডাম স্মিথ বা জেরেমি বেন্থেম। সমারসেটের যে কেসের রায়ের সাথে সাথে ইংল্যান্ডে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটে (যদিও উপনিবেশগুলিতে জারি ছিল) , সেই রায় যিনি দিয়েছিলেন, সেই ধর্মপ্রাণ লর্ড ম্যানফিল্ড কিন্তু তার রায়ে ধর্মের কথা একবারের জন্যও উল্লেখ করেননি। ধর্মীয় নৈতিকতা আমার মতে যুগের সাথে তাল মিলিয়েই চলে, বরং ধর্ম দ্বারা যুগ কমই প্রভাবিত হয়।

আমি তো বলব, ধর্ম বরং দাসপ্রথার স্বপক্ষেই বেশী কথা বলেছে। অনেকবারই ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যবহার হয়েছে দাসপ্রথাকে আদালতে সমর্থন জানাতে। মার্ক টোয়েন তার নিজের মা সম্পর্কে বলেন যে তিনি নাকি অসম্ভব দয়ালু ছিলেন কিন্তু সর্বদা দাসপ্রথা সমর্থন করে এসেছেন। কারণ, উনি সবসময় ধর্মীয় বাণীতে শুনে এসেছেন যে দাসপ্রথা ঈশ্বরের ইচ্ছায় চলে। ধর্ম থাকুক বা না থাকুক - সব সময়ই ভাল লোকে ভাল কাজ করবে আর খারাপ লোকে খারাপ কাজ করবে। কিন্তু ভাল লোককে দিয়ে খারাপ কাজ করানোতে ধর্মের জুড়ি নেই।

কদিন আগে একটা ই-মেল পেলাম আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স থেকে। তাতে একটা কনফারেন্সের কথা ছিল - যার বিষয়বস্তু হল ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা। আমিও ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে আলোচনা চাই কিন্তু 'গঠনমূলক' নয় । বিজ্ঞানের একটা বড় অবদান হল যে বিজ্ঞান বুদ্ধিমান মানুষকে অন্তত ধার্মিক হতে দেয় না। আমার মনে হয় না আমরা এ থেকে পিছিয়ে আসব।

স্টিভেন ওয়েইনবার্গ ১৯৭৯ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী। বর্তমানে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের (অস্টিন) অধ্যাপক। বিজ্ঞান লেখক এবং বর্তমান সময়ের অন্যতম আলোচিত দার্শনিক। *The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe, Dreams of a Final Theory: The Search for the Fundamental Laws of Nature* সহ অনেক জনপ্রিয় বইয়ের লেখক। এই লেখাটা নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব বুকস –এ প্রকাশিত হয়েছিল ২১শে অক্টোবর, ১৯৯৯ সালে। এ নিয়ে উনি কিছু আলোচনাও করেছিলেন ম্যাগাজিনের সাইটে।

দিগন্ত সরকার, আমেরিকায় বসবাসরত কম্পিউটার প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞান লেখক। ইমেইল - diganta_sarkar@yahoo.com